আমার বাবাকে যেমন দেখেছি
সিরাজুস সালেকিন

সবার কাছেই নিজের বাবা-মা একজন মহৎ মানুষ। আমার কাছেও তেমনি আমার বাবা একজন আদর্শবাণ আর মহৎ মানুষ। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আর আমার আদর্শ আমার বাবা সম্পর্কে তাই কিছু লিখতে পেরে আমার বুকের মধ্যের ক্ষতটা একটু হলেও বোধহয় কমবে - শান্তি পাবো এই ভেবে যে এরকম একজন আদর্শবাণ মহাপ্রাণ একজন মানুষের সন্তান আমি। আমার গর্ব এখানেই। আর এই স্মৃতিচারণে অনেকের হয়তো আত্মপ্রচার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেষ্টা করেছি বিষয়টি এড়িয়ে যেতে। বাবা আত্মপ্রচার বিরোধী ছিলেন আর আমরাও বিষয়টি এড়িয়ে চলি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫। সিডনীর বঙ্গবন্ধু পরিষদের দুই কর্ণধার ডা: খোকন ও ড: কাইউম পারভেজ অনুরোধ জানালেন তাঁদের একুশের অনুষ্ঠানে (২৭শে ফেব্রুয়ারী) প্রতীতি-কে অংশগ্রহন করতে হবে। সিডনীর অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীতি আমার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছে গত ৮/৯ বছর থেকে। একুশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করা আমাদের সবার জন্যই গৌরবের - তাই রাজী হলাম সাথে সাথেই। ২৬ তারিখ ছিল তার চূড়ান্ত মহড়া। বাবার সেই বিখ্যাত গান - 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়' - এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল আমার গানের তালিকায়। গানটি আমারই গাওয়ার কথা। প্রায় চারটা বাজছে। প্রতীতির কয়েকজন এর মধ্যে এসেও গেছে। হঠাৎ সেই ফোন - আমার স্ত্রী শুচি ফোনটা ধরলো। কি কারণে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু একটা খারাপ খবর আছে। ও আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে বললো - বাবার শরীরটা খুব খারাপ - তোমার এখনই ঢাকা যাওয়া দরকার। আমি বললাম - কেমন খারাপ - বেচে আছেন তো? শুচি আমার কথার উত্তর না দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। আমি বুঝলাম - আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে - আমার বাবাকে। মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কোনদিনও ভাবিনি বাবাকে হারাতে হবে - মনে হোতো যেন বাবা চিরকাল থাকবেন আমাদের মাঝে।

বাবার কাছে শুনেছি আমাদের বরিশালের রায়পাশা গ্রাম ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। গ্রামের আশেপাশে কীর্তনীয়া দল ছিল তিনটি। প্রায়ই পালা গান হোতো। রাধার মানভন্জন, নৌকা বিলাস, নিমাই সন্নাস। এসব পালার প্রথম সারির দর্শক ছিলেন বাবা।
এসব পালায় কোন যন্ত্রী বা গায়কের অনুপস্থিতিতে বাবার ডাক পড়তো। এভাবেই বাবা যাত্রা-পালার দলে জড়িয়ে পড়েন এবং হারমোনিয়াম, দোতরা এসব যন্ত্র বাজাতে শেখেন। বাবার কাছে শুনেছি অনেক সময় এসব আসরে বাবাকে হিন্দু নামে পরিচয় করিয়ে দেয়া হোতো।

আমাদের গ্রামের বাড়ীর প্রতিবেশী ভূজঙ্গ ভূষন বোস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করে ফিরেছেন। তাঁরই ছোট ভাই নির্মল কুমার বসু ভালো গান করতে পারতেন - কিন্তু হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন না। বাবা তার সাথে হারমোনিয়াম বাজাতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর গানও করতেন। পরিচিতি লাভ করতে লাগলেন গায়ক হিসেবে।
এরপরই বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন - সিক্সটিন বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানের সাথে চলে যান দার্জিলিং। চার মাস পর এলেন হায়দ্রাবাদে আর মাসখানেক পরে বোম্বে। ব্যাটালিয়ানকে যুদ্ধের জন্য ভারতের বাইরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব এলে গান্ধীজি তা রোধ করেন। বাতিল হয়ে যায় সিক্সটিন বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান। কলকাতায় চলে এলেন তিনি।

১৯৪৫ এর কথা। বাবা তখন যুদ্ধ ফেরত নবীন যুবক। কলকাতা কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'সূত্রযজ্ঞ' শিল্পীদলের সদস্য। এ সময় বাবাকে গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালীতে পাঠানো হয়েছিল গান করতে। সেখান থেকে গান্ধীজি কলকাতার ফিরে এলে তাঁর সন্মানে কলকাতা ইন্জিনিয়ারিং কলেজে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানেও গান্ধীজির সামনে

গান গাওয়ার সুযোগ হয় বাবার। এ সময় বাবার আর্থিক কষ্ট ছিল নিদারুন। একবেলা রুটি খেয়ে কোনমতে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু এ সময়ে বাবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিতে থাকেন সুরেন্দ্রনাথ দাসের কাছে। প্রায় তিন বছর গুরু সেবা করেন তিনি ও তালিম নিতে থাকেন।

বরিশালের সেই বোসের বাড়ীর গল্প আমরা পরিবারের সবাই এত শুনেছি যে ওনাকে না দেখেও সে বাড়ীর এবং ভূজঙ্গ ভূষন বোস এর প্রতি আমাদের অন্যরকম শ্রদ্ধা ছিল। প্রতিবার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে বোসের বাড়ী আমরা বেড়াতে যেতাম সপরিবারে - যদিও তা পরে দখল করে নিয়েছিল আমাদের গ্রামের মুসলমান চেয়ারম্যান। এখনও তা তাদের দখলে।

দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ এ ঢাকা ফিরে এলেন বাবা। সে বছরই অডিশন দিয়ে পাশ করলেন। বাবা প্রথম যে গান করেছিলেন রেডিওতে - সেটি ছিল নিজের লেখা ও সুর করা। গানটির কথা ছিল:
ততবার গেছ সরে
যতবার আমি চেয়েছি তোমায়
জড়াতে বাহুর ডোরে'।

বিয়ের পর বাবা-মা (১৯৫৩)

১৯৫২-র ২৮শে ডিসেম্বর বাবা বিয়ে করেন প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান-এর চাচাত বোনকে। আমার মায়ের নাম নাজমা রসুল। আমাদের পরিবারের যাবতীয় সুখ-দু:খের

অংশীদার আমাদের মা। তাঁর জন্যই আমরা আজকে আমাদের এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। বাবার অনেক অন্যায় আবদার সহ্য করতে হয়েছে মা-কে। শিল্পী-র বউ আর পাঁচটা বউ এর মত নয় - আমরা এখন তা বুঝতে পারি। যখন তখন একগাদা লোক নিয়ে হাজির - খাওয়ার ব্যবস্থা করা, বাসায় গান শিখতে হরহামেশাই লোক আসছে - তাদের আপ্যায়ন করা, আবার কখন ও বা নিমন্ত্রণ করে এসে বাসায় বলতে ভূলে গেলেও তাদের আপত্যয়ন করা - এসব সামলাতে হয়েছে মা-কে স্বল্প আয়ের স্বামীর গৃহীনি হয়েও।

কামরুল মামা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাসায়। ছুটির দিন সারাদিন থেকে খেয়েদেয়ে রাতে বাসায় ফিরতেন। ওনার সাথে ব্রতচারী নৃত্যে অংশ নিয়েছি বিভিন্ন জায়গায়।

১৯৮৯ এ কোলকাতা গেলাম গান করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মবার্ষীকি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। বাবার কাছে তাঁর সেই সঙ্গীতগুরু শ্রী ভূজঙ্গ ভূষন বোসের ঠিকানা ছিল যিনি তখন কলকাতায় থাকেন। আমাকে বাবা বলে দিলেন আমি যেন অবশ্যই তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করি।

আমি বাবার কথায় রাজি হলেও আমার সন্দেহ ছিল ঠিকানা নিয়ে। আবার এ ও ভাবছিলাম তিনি এখন বেঁচে আছেন কি না। যাই হোক, বাবার আদেশমত ধূতি, শাড়ী আর মিস্টি নিয়ে ঠিকানা খুজে খুজে হাজির হোলাম। দরজায় কড়া নাড়লাম। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে দেখি বৃদ্ধ এক লোক ধূতি পরা, খালি গায়ে পূরোনো এক টাইপরাইটারে কি যেন টাইপ করছেন। কানে কম শোনেন বলে আমার কড়া নাড়ার শব্দ হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না। এবার বেশ জোরে কড়া নাড়লাম। উনি উঠে জানলা দিয়েই আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাংলাদেশ ও বরিশালের কথা বলতেই তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। এরপর আমি বাবার পরিচয় দিতেই তিনি যেন ভেঙে পড়লেন। উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন - এক পর্যায়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কিছুক্ষন ধরে আমাকে দেখতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন 'তুই লতির ব্যাডা? তুই মোগো লতির ব্যাডা? হোনসো.......' (শুনছো) বলে হাক ছাড়লেন পরিবাবরে সবার উদ্দেশ্যে। একে একে দেখা হোলো তাঁর পরিবারের সবার সাথে। আমাদের পরিবার, আমাদের গ্রাম আর বাবার অনেক কথা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমাকে আর ছাড়লেন না - দুপুরে খাইয়ে তবে ছাড়লেন। বিদায় নেবার সময় আবার একদফা কান্নাকাটি। বাবাকে এরা এত ভালোবাসতেন - না দেখলে বুঝতাম না। ঢাকায় ফিরে বাবাকে এসব ঘটনা বলতেই বাবাও কাঁদতে লাগলেন। বাবাও ওনার অনেক কথা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানি বাবা ওনাকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন।

আমার প্রথম সংগীত শিক্ষা বাবার কাছে। প্রথম গান গাই বাবার সাথে ১৯৬২ তে। খুব সম্ভব ২৭ বা ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬২। আমার বয়স তখন ৬ বছর। শের-এ-বাংলা ফজলুল হক মারা গেলেন সেদিন। বাবা তাঁর স্মরণে গান লিখলেন

’’কালো মেঘে ঘিরিল রে আকাশের ওই চাঁদ কালো মেঘে ঘিরিল রে
পূর্ণিমার রাত্রি হইল আন্ধারে মইলান কালো মেঘে ঘিরিল রে।
আইছ ভবে যাইতে হবে সর্বলোকে জানা
দিন থাকিতে দ্বীনের খবর কর না কেন মনা কালো মেঘে ঘিরিল রে ।
শোন শোন শহরবাসী নগরবাসী ভাই
শের-এ-বাংলা ফজলুল হক আর এই দুনিয়ায় নাই’’।

গানটা ছিল অনেক বড়, শের-এ-বাংলার জীবনী ও তাঁর নানা কর্মকান্ডের বর্ণণা ছিল গানটিতে। মনে পড়ে গানটা লেখার সময় বাবা আমদের ভাই-বোনকে কয়েক ঘন্টা চুপচাপ থাকার নির্দেশ দিলেন। মা সেদিকে খেয়াল রাখলেন যেন আমাদের দুষ্টুমিতে বাবার মনোযোগের ব্যাঘাত না ঘটে। গান লেখা শেষ করে বাবা আমাকে আর আমার বড় বোন মালাকে বললেন ‘তোরা কি গাইতে পারবি গানটা আমার সাথে?‘। আমরা সাথে সাথে রাজী। আমাদেরকে গানটা মাত্র একবার শুনিয়ে দিলেন, আর বললেন বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমারা যেন একসাথে গাই। পথে স্কুটারে যাওয়ার সময় বাবা গানটা গাচ্ছিলেন আর আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের ধরতে হবে। আমার

বাবা ও মামা পটুয়া কামরুল হাসান

এখনো মনে আছে আমরা কার্জন হলে যখন পৌছি - তখন হাজার হাজার মানুষ সেখানে এসেছে তাঁদের প্রিয় নেতার মৃত্যুতে নাগরিক কমিটি আয়োজিত শোকসভায় শ্রদ্ধা জানাতে।

আমরা সে রাত্রে কার্জন হল, প্রেস ক্লাব আর পরের দিন খুব সম্ভব বাংলা একাডেমী আর পুরোনো ঢাকার কোনো একটা হলে গানটি গেয়েছিলাম বাবার সাথে। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম গানটি গাইতে গাইতে বাবা কাঁদছিলেন আর সাথে সাথে দর্শকরাও হু হু করে কাঁদছিলেন। দেশদরদী কোনো নেতার জন্য এমন হাজার হাজার মানুষের কান্না আমি কখনও দেখিনি - দেখবোনা হয়তো আর কোনদিন। রাজনৈতিক কোনো নেতার জন্য যে দেশের সাধারন মানুষের এত ভালোবাসা থাকে - আর কখনো তা দেখিনি এ জীবনে। যাই হোক, এভাবেই শুরু হোলো আমার গানের জগতে হাতেখড়ি।

এর পর থেকে রেডিও পাকিস্তানে ছোটদের আসরে নিয়মিত গান করতাম। তখন আমাদের সাথে আর যারা অংশ নিতেন তাদের মধ্যে শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমীন, লাকি আখন্দ, হ্যাপি আখন্দ - এদের কথা মনে পড়ে। তখন শাহবাগে ছিল রেডিও অফিস। মাসে দু'একবার গান করতাম রেডিওতে। আমাদের যারা গান শিখাতেন, তাঁদের মধ্যে বাবা ছাড়াও বিশেষভাবে মনে পড়ে আবদুল আহাদ, সমর দাস, কাদের জামেরী, ধীর আলি মিয়া, খবির উদ্দীন - এঁদের কথা। বাবার পরিচালনায় সে সময়ের একটা বিখ্যাত অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে - 'আম কুড়ানি বাও'। সময়টা ১৯৬৬-৬৮। রেডিও অফিসে সে সময় দেখতাম শিল্পীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

সে সময়কার অন্যান্য সব শিল্পীর মতই বাবারও একটা সাইকেল ছিল। অফিস থেকে ফিরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোতেন গান শিখাতে। এর মাঝে সময় পেলেই চলে যেতেন মাছ ধরতে - হয় ধানমন্ডি লেকে অথবা রমনা লেকে। মাছ ধরাটা বাবার প্রতিদিনের একটা কাজ ছিল। এ সময় সুধীন কাকা (শ্রী সুধীন দাস), হাদী চাচা (সৈয়দ আবদুল হাদী), সোহরাব চাচা (সোহরাব হোসেন) নিয়মিত মাছ ধরতেন। মাঝে মাঝে বাবা ২০/২৫ সের ওজনের মাছ ধরে আনতেন। সমস্ত পাড়ায় যেন উৎসব লেগে যেতো তখন। মাছ ভাগ হয়ে যেতো পাড়ার সব বাসায়।

১৯৬৯ এর গন-আন্দোলনের সময় দেখেছি বাবার দেশপ্রেম আর প্রতিবাদী ভূমিকা। সেই উত্তাল দিনগুলিতে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায়, ছাত্রদের প্রতিবাদী অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক সভায় বাবার গান যেন ছিল এক অবিচ্ছদ্দ অংশ। পাকিস্তান সরকারের চাকরী করা সত্বেও সরকার-বিরোধী এ সব আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়েছেন অবলীলায় - এ ছিল দেশের প্রতি বাবার এক রকম দায়বদ্ধতা।

এসময় বাবা রচনা করেন সেই বিখ্যাত গান - সোনা সোনা সোনা - লোকে বলে সোনা' গানটি। আমার মতে বাবার সৃষ্ট বিখ্যাত তিনটি গানের মধ্যে এটি একটি। ভারতের বিখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৭৩ সালে কোলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির অনুষ্ঠানে বাবাকে এ গানটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন

‘এমন একটা গান লিখতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। এ গানে সমস্ত বাংলাদেশের ছবি একেছেন আপনি - কি অপূর্ব!!‘। গুনী মানুষের বিনয় থাকে বটে - তবে মাঝে মাঝে এর মাঝে সততাও থাকে। বাবার কাছে এ গল্প শুনেছি বহুবার।

জহির রায়হান আর আলতাফ মাহমুদ আসতেন প্রায়ই আমাদের বাসায়। সময়টা খুব সম্ভব ১৯৬৭-৬৮ সাল। জহির রায়হানের প্রায় সব ছবিতেই বাবার গান থাকতো। বাবা গান লিখতেন, সুর করতেন - আলতাফ মাহমুদ ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। জহির রায়হানের ‘শেষ পর্যন্ত‘ ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বাবা। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও বাবা মা-কে বলতেন ‘জহির রায়হান কে একটু খবর দাও তো‘। বার্ধক্যজনিত কারণে বাবার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিল। সব ভুলে যেতেন। পূরোনো স্মৃতিগুলো হয়তো ফিরে আসতো আর সেই সাথে হয়তো মনে হোতো পূরোনো সজনদের কথা।

১৯৭৩ এ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির আমন্ত্রণে কলকাতায় গান পরিবেশনরত বাবা

আর এক অভুতপূর্ব ঘটনা ছিল বাবার সাথে বাজারে যাওয়া। বাজারের সমস্ত বিক্রেতারা হৈ হৈ করে উঠতেন বাবাকে দেখে। যেন তাঁদের নিজেদের মানুষ এসেছেন বাজারে। মাঝে মাঝে রিকশা ভাড়াটাও ওরাই দিয়ে দিতেন অনেক আপত্তি সত্বেও। দুটো বড় মাছ কিনে একটা মাছ বিক্রেতাকে দিতেন তাঁর পরিবার নিয়ে খাওয়ার জন্য। গত ১৯৯৭-তে প্রথমবার দেশে ফিরেও বাবার সাথে বাজারে গিয়ে একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি। মাছ বিক্রেতা বাবার এমন ব্যবহারে আবেগে কাঁদতে লাগলো। আবার বাজারে গিয়ে বাবাকে কোনদিন দরাদরি করতে দেখিনি।

বিক্রেতারা মাছ, মুরগী, মাংস, সবজী - সব বাবার বাজারের থলিতে ঢুকিয়ে দিত। সন্ধ্যার পরে বাসায় এসে ওরা দাম নিয়ে যেত।

আমাদের ছোটবেলায় আমাদের ঈদের কাপড় কেনা হোক আর না হোক, বাবা অবশ্যই কাপড় দিতেন যিনি আমাদের চুল কাটতেন - যদিও সে হিন্দু-ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কাপড় দিতেন বাজারের মাছ-সবজী বিক্রেতাদের, শাহজাহান নামে একটি ছেলে যে বাবার মটর সাইকেলটি মেরামত করতো -তাঁদের। শাহজাহানের বিয়ের সময় বেশ বড় রকমের একটি আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন বাবা। অথচ আমাদের অর্থের প্রচুর্যতা ছিল না কখনও। এই সমস্ত লোকরা প্রায়ই বিভিন্ন পার্বণে আমাদের বাসায় পুরো পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসতেন। না খেয়ে তারা কোনদিনও যাননি। আমরা এভাবেই বড় হয়েছি আর শিখেছি সব রকমের মানুষের সাথে মিশতে। এজন্য আমাদের কোন হিনমন্যতা ছিলনা - এখনো নেই।

বাবার প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে‘। বাবার নকণ্ঠে এ গান আমি শুনেছি বেশ কয়েকবার। ‘এ মনিহার আমায় নাহি সাজে‘ - এ গানটিও আমি শুনেছি বাবার দরাজ কণ্ঠে।

গান করছেন বেদারুদ্দিন আহমেদ। বাঁ থেকে: লায়লা আর্জুমান্দ বাণু, আবদুল হালিম চৌধুরী, সোহরাব হোসেন, বেদারুদ্দিন আহমেদ, বাবা ও আবদুল আলীম

ছোটবেলায় দেখেছি বাবার কাছে গান শিখতে আসতেন অনেকে। এদের মধ্যে লতিফা চৌধুরী, শামিমা বেগম, ফৌজিয়া খান, ইসমত আরা, আবদুল আলীম, আনোয়ার উদ্দীন খান, এম এ হামিদ, নীনা হামিদ, শামসুন্নাহার করিম, নাজমুল হুদা বাচ্চু, রওশন আরা মাসুদ, ফেরদৌসী রহমান, নীরু শামসুন্নাহার, মোহাম্মাদ আলী সিদ্দীকি, সৈয়দ আবদুল হাদী,

আবদুর রউফ, পরে বড় হয়ে শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমিন, মীনা বড়ুয়া, লতিফা হেলেন, রথীন্দ্র নাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী -র নাম মনে পড়ছে। এরা সবাই আমাদের পরিবারের একজন হয়ে ছিলেন - এখনো তাঁরা তেমনিই আছেন - আমাদের চাচা আর ফুপু হয়ে। আমাদের সুখ-দু:খে ওনারাই ছিলেন আমাদের সাথে - সবসময়। ঈদের সময় সবাই আসতেন বাব-মা-কে সালাম করতে।

গান শিখাচ্ছেন বাবা, সাথে তবলা বাজাচ্ছেন কলিম শরাফী

আজকাল আর তেমনটি দেখিনা। শ্রদ্ধা-ভালোবাসার আদান-প্রদান যেন নেই বললেই চলে। সবটাই কেমন যেন মেকি - কপটতায় ভরা। আজকাল দেখি অন্যান্য অঙ্গনের মত গানের জগতেও নোংরা রাজনীতি আর দলাদলি।

কবি ফররুখ আহমেদ বাবা-কে শাহসাহেব বলে ডাকতেন। বাবার লেখা মারফতী গানের কারণেই ফররুখ চাচা বাবাকে এ নামে ডাকতেন। তিনি বলতেন যে অনেক বেশী ধার্মিক হয়েও তিনি বাবার মত এমন গান লিখতে পারেননি। বাবার মারফতী ও ভক্তিমূলক গানগুলির মধ্যে দুয়ারে আইসাছে পালকি, পরের জাগা পরের জমি, আমারে সাজাইয়া দিও নওশার সাজন, মনে বড় আশা ছিল যাব মদীনায়, তুমি যে শাহে মদিনা, সকল নামের সেরা তুমি - এসব গান বাঙালিরা গাইবে আরও অনেকদিন।

একবার আমি আর বাবা পাখী শিকারে গেলাম, সাথে ছিলেন আলীম চাচা (গায়ক আবদুল আলীম)। গ্রামের মানুষ বাবা আর চাচা-কে চিনতে পেরে আর আমাদের পাখী শিকারে আর যেতে দিলেন না। গ্রামের চেয়ারম্যান গরু জবাই করে খাওয়ালেন সবাইকে। রাতে বসলো বাবার কিচ্ছা আর পুথি-পাঠের আসর আর শেষে আলিম চাচার গান। সে রাতের কথা ভূলবোনা কোনদিন।

কবিয়াল রমেশ শীল ও কবি হাসান হাফিজুর রহমান-এর মৃত্যুবার্ষীকি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত বাবা

বাবা মুকুন্দদাস, পল্লী কবি জসীমুদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন, কানাইলাল শীল, মনোমোহন দত্ত, মমতাজ আলী খান আর কবিয়াল রমেশ শীল এর ভক্ত ছিলেন। ওনাদের অনেক গান শুনেছি বাবার কন্ঠে। এ সমস্ত মনিষীদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন সভায় তাঁদের সম্পর্কে বাবার বক্তৃতা শুনে বিস্মিত হয়েছি। বাবা কথা প্রসঙ্গে বলতেন যে আমরা কয়জন জানি যে শচীনদেব বর্মন-এর গাওয়া বিখ্যাত গান - বন্ধু রঙ্গীলা, রঙ্গীলা, রঙ্গীলা রে, আমারে ছাড়িয়ারে বন্ধু কই গেলা রে' - গানটির রচয়িতা ও সুরকার মমতাজ আলী খান। লোকগানের প্রতি আমাদের অবহেলা ও ইদানিংকার বিকৃতি বাবাকে কষ্ট দিত। অথচ বাংলাদেশ মানেই তো গ্রাম আর এর গ্রামীন মানুষ।

একবার গায়ক আবদুল আলীম বাবাকে এসে ধরলেন তাঁর জন্য একটা আধুনিক গান লিখে দেয়ার জন্য। সাথে সাথেই আলীম চাচার গলা ও গায়কী উপযোগী গান লিখে ও সুর করে দিলেন। গানটি হোলো:
'দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথার চিরুণী,
এনে দেব হাট থেকে মান তুমি কোরো না'

ঠিক এমনি করেই আলীম চাচার জন্য রচনা করেন দেশের গান,
'আমার দেশের মতন এমন দেশকি কোথাও আছে
বউ কথা কও পাখী ডাকে নিত্য হিজল গাছে'।

মার্চ ১৯৭১, আমাদের গৌরনময় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাস। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সপ্তাহ দু'এক আগে আমরা চলে গেলাম বরিশাল, আমাদের দাদাবাড়ী। তখন আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা। গ্রামে দাদাবাড়ীর প্রতিদিন শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। জল্লাদের দরবার, চরমপত্র, রণাঙ্গনের খবর - এসব অনুষ্ঠান শুনতাম। তবে সবচেয়ে ভালো লাগতো এর গানগুলি। বাবার লেখা 'সোনা সোনা সোনা' গানটি শুনতাম আর আবেগে আপ্লুত হয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়তো, প্রচন্ড ভালোবাসতে শিখলাম দেশকে। আমার মনে আছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রায় সব গান তখন আমার কণ্ঠস্থ। চাচতো ভাইদের অনুরোধে সে গানগুলি গাইতাম প্রায় প্রতিদিন। এর মধ্যে বাবার খবর অনেকদিন পাচ্ছিনা - হঠাং একদিন বাবা এসে হাজির বরিশালে - দেখে মনে হোলো বয়স যেন বেড়ে গ্যাছে রাতারাতি। কিছুদিন পর পকিস্তানী হানাদার বাহিনী এসে আমাদের গ্রাম আক্রমণ করলো। মহিলারা সব নৌকায় বাড়ি ছেড়ে পালালো। আমি, আমার এক চাচাতো ভাই বাবলা আর বাবা - আমরা পায়ে হেটে, খাল সাতরিয়ে পালালাম। শেষ বিকেলের দিকে গিয়ে উঠলাম অচেনা এক গ্রামে। এক লোক আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। বাবা ভয় পেলেন - কারণ সে সময় রাজাকারদের উৎপাত ছিল বেশী। বাবা ভূল পরিচয় দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু অচেনা লোকটি বাবাকে চিনতে পারলেন এবং আমাদের আশ্রয় দিলেন, খাবার দিলেন। রাতে আবার আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিলেন। পায়ে হেটে প্রায় ১৬ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বারী পৌছলাম গভীর রাতে।

এর মধ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহীনি শুরু করলো গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। আমরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। সে এক নিদারুন কস্টের দিন! কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার এর গান আমাকে পেয়ে বসলো। দেশ স্বাধীন হোলো ডিসেম্বরে। ৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরবেন। আমি সেদিন আমাদের একটা ইলেকট্রিক অর্গান নিয়ে (পাশের বাড়ী থেকে বড় তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নিয়ে) রাস্তার পাশে বসে স্বাধীন বাংলা বেতারের সেইসব গান বাজাতে শুরু করলাম - সাথে ছিল ২/১ জন বন্ধু। অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল আশেপাশে। সবাই যাচ্ছে বিমানবন্দরের দিকে হেটে হেটে, বাসে, গাড়ীতে, রিকসায়-স্কুটারে - সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো আমার এই কর্মকান্ড।

এভাবেই ক্রমে ক্রমে গানের প্রতি আসক্তি তৈরী হোলো। বাবার মত নিয়ে নজরুল একাডেমী ও পরে ছায়ানটে গান শেখা শুরু হোলো আমার। দেশকে আর গানকে ভালোবাসতে শিখেছি বাবাকে দেখে।

মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আজীবন অবদানের জন্য শিল্পী আবদুল লতিফের (ডান থেকে দ্বিতীয়) হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)। তাদের পাশে অঞ্জন চৌধুরী ও হানিফ সংকেত

দেশ স্বাধীন হবার পর খুব কষ্টে কাটিয়েছি কয়েকটা বছর। আমাদের ভাই-বোনদের, মা-বাবার পরার কাপড় ছিলনা একটার বেশী। এসময় আমাদের এক শুভানুধ্যায়ী, এক বীর মুক্তিযোদ্ধা আর্থিক সাহায্য ও বাসস্থানের (শত্রু সম্পত্তি) ব্যাবস্থা করতে এগিয়ে আসেন। বাবা এসব অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি ছিলাম বাবার সহযোগী সে ঘটনায়। অথচ অনেকেই সে সময় নানা উপায়ে শত্রু সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন। আমি ব্যাক্তিগতভাবে চিনি এমন কয়েকজনকে।

ফেরদৌসী রহমান-এর কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহন করছেন

বাবার একটা জিনিস আমি খুব বেশী পছন্দ করতাম - সেটা হচ্ছে ওনার নীতিবোধ। যা বিশ্বাস করতেন - তা ই বলতেন, করতেন - প্রকাশ করতেন আচরণে, কথায়, গানে। আজকালকার অনেক বুদ্ধিজীবিদের মতন নিজেকে বিকিয়ে দেননি, বিশেষ কারো ধামাধরা

হয়ে থাকেননি। আমিও আমার জীবনে বাবাকে আদর্শ মেনে অনেকের অপ্রিয় হয়েছি সত্যি কথা বলার জন্য। আমি এখনো সেরকমই আছি। প্রায় দশ বছর প্রবাসে থেকেও নিজেকে বদলাইনো এতটুকুও।

মরমী শিল্পী হাসন রাজা স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত বাবা

আমার বিয়ের পর দেখেছি বাবা আমার স্ত্রী কে আমাদের সংসারের কাজে সাহায্য করতেন। আমরা যখন আলাদা বাসা নিলাম - বাবা মাঝে মাঝেই আমাদের জন্য এটা-ওটা নিয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে ৩টা কই মাছ বা কয়েক টুকরো রুই মাছ। অর্থাৎ আমাদের ৩টা, আমার বড় বোনের জন্য ৪টা আর নিজেদের জন্য বাকী মাছ। আমাদেরকে না দিয়ে কোনদিন কোনকিছু খেয়েছেন - মনে পড়ে না।

বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন যখন বাংলা-একাডেমীতে একবার গান গাইতে গিয়ে কিছু উছৃঙ্খল ছাত্ররা বাবাকে অপমান করেছিল। গানটার বিষয়বস্তু ছিল হালে ছাত্রদের নৈতিক আবক্ষয়। বাবা বলেছিলেন যে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলন করেছে, মুক্তিযুদ্ধ করেছে - সেই ছাত্রদের হাতে এখনও অস্ত্র কেন, কেন তারা হাইজ্যাকার হয়ে যাচ্ছে, কেন তারা মেয়েদের অপমান করছে, কেন পড়াশুনা-র বদলে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন সকালে বাবা খবরের কাগজে পড়ছিলেন যে বাঁধন নামে একটি মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা লাঞ্ছিত করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাবা সেদিনই সে গানটি রচনা করেন এবং বাংলা একাডেমী তে গানটি পরিবেশন করেন। আমার মনে হয়েছে আমাদের অসৎ রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যে কথা মুখ ফুটে

না বলে সবার মন জুগিয়ে চলেন, বাবা এর প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর সেই গানে। আর আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল সে সময় বাবার কাছের লোকরা এবং আমাদের দেশের বিবৃতিদানকারী বুদ্ধিজীবিরা কেউ বাবার পাশে এসে দাড়াননি - বরং বাবার সমালোচনা করেছেন।

বা দিক থেকে: শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, বাবা, হামিদা হক, ফাহমিদা খাতুন এবং শাহনাজ রহমতুল্লাহ (ফ্রক পরা)

বাবার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী সুধীন দাস, জনাব আসাদুল হক ও শ্রী অজিত রায়। আমাদের বাবার অবর্তমানে ওনারাই আমাদের ভাই-বোনদের সে অভাব পূরণ করবেন - এ প্রত্যয় আমাদের আছে। আমরা ওনাদের সে ভাবেই দেখি। বাবা যে রকম জীবন যাপন করতেন - ওনারাও সেভাবেই জীবন-যাপন করেন।

মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান জানানো হয় বাবাকে

প্রকৃত শিল্পীর মত জীবন-যাপন। মনে তাঁদের কোন ক্ষুদ্রতা নেই, মানুষকে ভালোবাসতে পারেন সহজেই। কারও বিত্ত-বৈভব দেখে তাকে ভালোবাসেন না। আজকাল আমাদের সমাজে বিত্ত-বৈভবময় মানুষেরই জয়-জয়কার। তারাই আমাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক। সমস্ত প্রাপ্তি, পুরস্কার শুধু তাদেরই।

মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে বরিশালের মেয়র কতৃক প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহনের জন্য বরিশাল যান, সাথে আমার ছোট ভাই ও বড় বোন

মহান ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখ বাবা যাত্রা করলেন অনন্তলোকে। আমি হারালাম আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে - যাকে আমি আমার আদর্শ হিসেবে জীবনে গ্রহন করেছি। বাবার মত নীতিবান, সৎ আর মানবতাবাদী মানুষ আমার জীবনে আমি কমই দেখেছি।

আজকাল বাংলাদেশে অসংখ্য শিল্পী, গীতিকার, সুরকার। কিন্তু বাবার মত বিনয়ী, আদর্শবান আর মানবতাবাদী মানুষ আর দেখিনা। বাংলা ভাষা আর আর বাঙালির সংস্কৃতির কাছে নতজানু থেকেছেন সারাজীবন। নিজের পরিবারের সদস্যদের বাদ দিয়ে হলেও যে গরীব মানুষের উপকার করা কর্তব্য - সেটা বাবার কাছে শিখেছি। মানুষ যদি মানুষের উপকারে না-ই আসলো - তবে আর মনুষত্ব কোথায়। আজকের বাংলাদেশে এটারই বড় অভাব। আজকে আমাদের দেশে চারিদিকে যে এত অন্ধকার - আমার মনে হয় আলো জ্বালাবার লোকগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সমাজ থেকে। যারাও বা আছেন - তারা আজ নিভৃতচারী। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে নেই কোন আদর্শ। সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম আজ কেবল কথার কথা। আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র - এ সব চেতনা আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের আবার এক হওয়া প্রয়োজন সেসব চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য।

কবিগুরুর কথা দিয়ে শেষ করি:

আছে দু:খ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।